সাহিত্যের রূপান্তর: রূপান্তরের সাহিত্য

মনোহর মৌলি বিশ্বাস*

এক নিরক্ষর পরিবারে আমার জন্ম। বাবা ছিল অতি ক্ষুদ্র চাষি। জমিজমা ছিল মাত্র কয়েক বিঘা। যৌথ পরিবার। বাবা-জ্যাঠা মিলে দিনরাত খাটত উদয়াস্ত পরিশ্রমের কাজ করত। কেবল দু-মুঠো পেটের ভাত জোগাতে। যে বছর ফসল ভাল হত কোনও মতে মোটা ভাত-কাপড়ে কাটত দিন। সুন্দরবনাঞ্চলের সামান্য উত্তরদিকে ছিল আমাদের বাস। যে বছর বঙ্গোপসাগরের লোনা জল ঢুকে পড়ত খেতখামারে নষ্ট হয়ে যেত ফসল। মানুষের দারিদ্র পৌঁছাত এক চরম সীমায়। ফ্যান-ভাতও জুটত না। লোনা জলে ভরা সেই মাঠে জন্মাত অজস্র শালুক। শালুক দলের নাম 'ঢ্যাপ-আর এই ঢ্যাপের বিচির খোসা ছাড়িয়ে রান্না হত ভাত। মাছের ডিমের মত হলুদ গোল গোল সে ভাত। দু-মুঠো খেলে পেটের খিদে মরে যেত আপনা থেকে।

ঢ্যাপের ভাত খেয়ে কোনও দিন গাঁয়ের পাঠশালায় যেতাম লেখা-পড়া শিখব বলে। ঢ্যাপের ভাত খেয়ে লেখাপড়া হয়তো কিছুটা শিখেছি — সেই অর্থে পণ্ডিত জন হয়ে উঠিনি। আমি আপনাদের পত্রিকায় এই লেখাটাতে প্রয়াসী হয়েছি। দুই পৃথিবীর কথা শোনাব বলে।

পরিসরগত দৃষ্টিকোণে বড় হয়ে দেখা দেয় মানুষের প্রান্তিকতা। প্রান্তজনের কথা নানাভাবে উদ্ভাসিত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে এই মানুষেরা নিজেদের উন্নয়নের কথা নিজেরাই ভাবতে শুরু করেছিল। ছোট আকারের গোলপাতার ঘরে, আমার গ্রামের যে পাঠশালাটি আমার জন্মেরও আগে গড়ে উঠেছিল তা, খুব স্পষ্ট করে ভাবতে পারি, তাদের আত্মোন্নয়নের নিজস্ব চেষ্টার ফসল। দেশের নিরক্ষর এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার সরকারি কোনও প্রয়াস প্রান্তিক অঞ্চলে প্রসারিত হয়নি তখনো। আমাদের গাঁ ছিল বেশ লম্বা — দুটি পাড়া ছিল। পূর্বপাড়া ও পশ্চিম পাড়া। ক্ষীণকায় কালিগাঙের উত্তর পাড়ের এই গাঁয়ে সবাই ছিল

---

* দলিত লেখক ও সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমি।

অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর মানুষ। কালিগাঙের দক্ষিণ পাড়ের গাঁটিও ছিল অনেক লম্বা — দুটি পাড়া। পূর্ব পাড়ায় বেশিরভাগ ছিল নমঃশূদ্রদের বাস আর পশ্চিম পাড়ায় ছিল জেলেদের বাস। আমার গাঁয়ে আমিই প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি। সে ১৯৫৯ সালের কথা। আমার পাশের এক বছর আগে ১৯৫৮ সালে কালিগঙের দক্ষিণ পাড়ের গাঁ থেকেও একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল।

এ আমার কোনও আত্মাভিমান নয়। এ কথাটুকু শোনানোর তো একটা লক্ষ্য আছে-কি তা? আমাদের এই অঞ্চলে সবারই ছিল খড়ের বাড়ি। মাঝে মধ্যে দু-একখানা টিন-টালির ঘর। মানুষের প্রান্তিকতা কি তা আমার কাছে কোনও শোনা গপ্পো নয় — অন্যের চোখ দিয়ে দেখা বিষয়ও নয়। আ-শৈশবের হাড়ে হাড়ে এক উপলব্ধ অভিজ্ঞতা। দারিদ্র কাকে বলে তা তো শৈশবে ঢ্যাপ-বিচির ভাত খেয়ে বুঝেছি। শিশু বয়সে বিদ্যায়তনে পা না রাখার কারণ বই পড়ে শেখার প্রয়োজন পড়ে না। বাঙলার বহু বহু গাঁ আছে যেখানে আমার গাঁয়ের মত গোলপাতার ঘরের একটা পাঠশালাও গড়া হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার চুয়াত্তর বছর পরেও। প্রায় বছর খানেক আগের কথা। ঝড়খালিতে গিয়ে দেখলাম, পূর্ববাঙলার সুন্দরবন অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষেরা বসবাস করছে সেখানে। রাত্রিবেলা সুন্দরবনের বাঘ এসে বাড়ির উঠোনে ছাপ রেখে যায় পায়ের। বর্ষার দিনে পথে এক হাঁটু কাদা। এবাড়ি থেকে সে বাড়িতে যাওয়া দায়। মা তার ৭/৮ বছরের শিশু কন্যাকে নিয়ে সকালবেলা রওনা হয়ে যাচ্ছে নদীতে কাঁকড়া ধরতে। না, এটা কোনও শখ নয় তাদের। নদী থেকে কাঁকড়া ধরতে পারলে দু'মুঠো ভাতের জোগাড় হবে তাদের। অন্যথায় উপবাসী থাকতে হয়—নতুবা হতে হয় একাহারী।

খালি গায়ে ইজার পরে মাথায় একটা টিনের হাঁড়ি নিয়ে পথ হেঁটে যাচ্ছে এক কন্যা—সাত-আট বছর বয়সের শিশু কন্যা। সে আমাকে এই সত্তর বছর বয়সে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল আমার শৈশবদিনের স্মৃতি। অমুক-কক্ষে হাতে নিয়ে আগুনের বড়াল (খড় নির্মিত) সযত্নে ধরে যেতে হবে মাঠে। মাঠে পৌঁছে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ কাজও করতে হত তাদের সাথে। বাপ-ঠাকুরদার জমি ছিল দু-পাঁচ বিঘে। নিজের জমিতে শ্রম দিত তারা। দেশভাগের বলি হয়ে এই মানুষগুলির তাও নেই। এ কথা তো সর্বহারাদের এক পরিচিত কথাবার্তা।

দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম যে বাড়িতে, বাড়ি মানে কিছুটা অংশ টিনের ছাউনি এবং কিছুটা অংশ টালির ছাউনি, মোটামুটিভাবে চলে যায় তাদের। মাটির দাওয়ায় বসে খেতে দিচ্ছিল মাঝবয়সের মেয়েটি। তার নাম সবিতা। বাপের বাড়ি দু'তিনটি গাঁ দূরে। স্বামী ভীষণ পরিশ্রমী। কত না খাটুনি খেটে খড়ের চাল বদলে টিন-টালি লাগাতে পেরেছে। সবিতা দেখাচ্ছিল তার পিঠে বাঘের থাবার দাগ হয়েছে বড় করে। তের-চোদ্দ বছর বয়সে ছোট ভাইকে নিয়ে খালে গিয়েছিল চিংড়ি পোনা ধরতে। ভাই মানে বেশ ছোট, ছয় সাত বছরের ছোট। দু'জনে উপুড় হয়ে চিংড়িপোনা জাল পেতে ধরছিল যখন সেই সময়ে জঙ্গলের আড়াল থেকে অতর্কিতে লাফিয়ে পড়েছিল বাঘ — যার লক্ষ্যছিল ছোট ভাই। সবিতার পিঠের উপরে ভর করে ছোট ভাইকে মুখে করে নিয়ে চলে গেল জঙ্গলে। সবিতা চ্যাচাঁতে চ্যাচাঁতে ফিরে এল গ্রামে। গ্রামের মানুষ এক যোগে চেষ্টা করল একটা শিশুর প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু কিছুই করতে পারল না তারা।

এই সময়ে দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের রূপান্তর — এক বিস্ময়কর রূপান্তর। কোনও এক সময়ে কলকাতায় আইআইএম পড়তে এসেছিল অমিয় - অমিয় ত্রিপাঠী। বাঙলার মানুষের সাথে পরিচয় ঘটে তার দারুণভাবে। শরৎ সাহিত্যের হিন্দি অনুবাদ পড়েছিল মনদিয়ে, পড়েছিল সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা-র ইংরেজি অনুবাদ। কর্পোরেট সেক্টরে বড় চাকরিতে থাকতে থাকতে উপন্যাস লেখার ভাবনা এল মাথায়। এই ভাবনায় নিহিত ছিল গতানুগতিকতার ধারা ভাঙার অঙ্গীকার। তাঁর উপন্যাসের নায়ক ভগবান বা তথাকথিত দেবতাদের নিয়ে লেখা উপন্যাস। শিবকে নিয়ে লেখা হল ট্রিলজি। এই শিব-ট্রিলজির প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'দ্য ইমুরিটালস অব মেলুহা'। নতুন ধারার গল্প পেয়ে পুলকিত হল পাঠক সমাজ। বিক্রি হল আড়াই লক্ষ কপি।[১] দেবতাদের চরিত্রসুধা, উপজীব্য করার কারনেই কি জনপ্রিয়তা? ২১শে জুন ২০১৫-এ মুম্বাই শহরে বড় করে প্রচার দিয়েই প্রকাশিত হল তার আরেকখানি উপন্যাস— নাম **'Scion of Ikshvaku'**। ইক্ষাকু রাজপরিবার নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে নায়ক তো ভগবান — ভগবান রামচন্দ্র নিজে। এই সময়ে তো ভারতবর্ষে গৈরিকি হাওয়া বইছে। মানবতার উদার সাম্রাজ্যে সে হাওয়া শরীর শীতল করে না কখনো। বাইরের দেখনাই যেমন চমক দেয় — বাইরে তার দেখনদারিত্ব বড় হয়ে দেখা দেয়। এই দেখনদারিত্ব ভিতরের মানবতার সাথে সাযুজ্য স্থাপন করে না কখনো। মানবতা হল মানুষের হৃদয় জাত বামপন্থা— বামপন্থার মধ্যে নিহিত উদারতা। মানব সমাজে এই বামপন্থার সরিক কে না? মানুষ এবং প্রকৃত অর্থে মানুষ মাত্রেই সকলে। দেখনাই বামপন্থার আবার আলাদা একটা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেখনদারিত্ব দুরে রেখে ভিতরটা আবিষ্কার দরকার। সে দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষে মার্কসবাদের প্রায়োগিক ভাষ্যকার ছিলেন বি. আর. আম্বেদকার। জাতপাতের বিলুপ্তিকরণের ভিতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগোবার কথা বলেছিলেন তিনি। বর্ণভিত্তিক সমাজে শ্রেণিহীন সমাজ গড়া যায় না, যায় না বলে যে একেবারেই যায় না তা নয়। যায় তখনই, যদি সাংস্কৃতিক বিপ্লব করে মানুষের মনন সাম্রাজ্যে বদল ঘটানো যায়। মানুষ মন থেকে মুছে ফেলতে পারে তার জাতের অহঙ্কার। বর্ণ-ভিত্তি করে অনন্তকাল ধরে চলে আসা আধিপাত্যবাদ। ইতালির মার্কসবাদী তাত্ত্বিক গ্রামশির কথা মনে করতে পারি। আধিপত্যবাদ ভাঙার কথা বলে ছিল বলে জেলে যেতে হয়েছিল তাকে।[২]

বি. আর. আম্বেদকর অতটা এগিয়ে কথা বলেননি। তিনি তাঁর স্টেট সোস্যালইজম-এ (State Socialism) বলেছিলেন ইক্যুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ (equitable distribution of wealth')[৩]-এর কথা। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে।

১। অমিয় ত্রিপাঠী, দ্য ইমুরিটালস অব মেলুয়া, ওয়েস্ট ল্যাণ্ড লিমিটেড, ২য় তল, সিলভার লাইন বিল্ডিং, চেন্নাই ৬০০ ০৯৫, টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত শৌণক ঘোষালের রিপোর্ট জুন ২৪, ২০১৫, পৃ ৫।

২. সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রামশি পরিচয়, পার্ল পাবলিশার্স, কল - ৬ ১ম সং ১৯৯৩, পৃ ৫।

৩. **Dr. Babasaheb Ambedkar : Writing and Speeches, Education Department, Government of Maharastra, Vol-Ist Ed. 1989. pp 408**

ব্রিটিশ সরকারও বুঝে গেছে, ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ তাদের সামনে খোলা নেই। একটা নব-স্বাধীনতা লব্ধ দেশের জন্য — বিশেষ করে তার নির্মানের জন্য প্রয়োজন 'State Socialism'. তিনি বললেন : **Without the supply of Capital by the State neither land nor industry can be made to yield better rsults. It also proposes to nationalize insurance with a double objective. Nationalized insurance gives the individual greatly security than a private insurance. Firm does in as much as it pledges the resources of the state as a security for the ultimate payment of his insurance money. It also gives the State the resources necessary for financing its economic planning in the absence of which it would have to resort to borrowing from money market at a high rate at interest. State Socialism is essential for the rapid industrialization of India. Private enterprise cannot do it and if it did a state would produce those inequalities of wealth which private capitalism has produced in Europe and which should be a warning to Indians.**[8]

প্রান্তিক মানুষজন ভারতবর্ষে এবং বৃহত্তর অংশের মানুষ প্রান্তিক এদেশে। এবং যে ভাষ্য মানুষের কল্যাণের কথা বলে তাই-ই তো সাহিত্য— রূপান্তরের সাহিত্যই হল তাইই। স্বাধীনতার উত্তরকালের বয়স চুয়াত্তর বছর ছুঁই ছুঁই করছে। কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি, কখনো বা জনতাদল কখনও বিজেপি শাসন ক্ষমতায় বসেছে দিল্লীর মসনদে। সবাই দৌড়াচ্ছে 'মানি মার্কেটে'র পেছনে। সেজ (স্পেশাল ইকনোমিক জোন) গড়বার সুযোগ তুলে দেওয়া হচ্ছে তাদের হাতে। বিনিময়ে শিল্প হবে দেশের। সে শিল্প জনগণের কতটা কল্যাণ করবে তা নিয়ে ভাববার সময় বড় কম। এমনকি ভারতবর্ষের যে যে রাজ্যে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে তারাও সেজ (SEZ)-এর পালনপোষণ করতে চাইছে — কিংবা করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র চাষীদের উর্বর কৃষি জমি কমিউনিস্ট শাসন কালে মোটরগাড়ি নির্মাণের কারখানা গড়বার জন্যে টাটা-গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া তো একটা বড় ইতিহাস হয়ে আছে। সিঙ্গুরের কৃষিজমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রতিবাদী আন্দোলন ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল কমিউনিস্ট সরকারের। পরবর্তী নির্বাচনে কমিউনিস্ট সরকারকে বিদায় করে কাজ-ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল যারা তারাও মূলত এদেশের প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে আপনজন এমনটা মনে হয় না। বিগত শতকের নয়-এর দশকের গোড়ায় মণ্ডল-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্য দিবালোকে এসেছিল। সরকারি লোহার তোরঙ্গ থেকে এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পিছনেও ছিল রাজনৈতিক কারণ। অনগ্রসর শ্রেণিসমূহের কল্যাণের নিমিত্ত শিক্ষাও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ প্রদানের কথা বলা ছিল সেই রিপোর্টে। চারদিকে এই সংরক্ষণের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল প্রবল আন্দোলন। আমার বদলির চাকরিতে কলকাতার টেলিকম ফ্যাক্টরি থেকে বদলি হয়ে উত্তর প্রদেশের গোণ্ডাজেলার মানকাপুর আইটিআই ফ্যাক্টরিতে যাবার নির্দেশ ছিল। দিনটির কথা মনে নেই এখন — কিংবা কষ্ট করে মনে করতে চাইছি না তা। বদলির কারণ খুব স্পষ্ট ছিল। একই চেয়ারে লঙ-স্টে। যার ১৪ বছরের স্টে (stay)

৪. ibid.

ছিল সে গেল খড়গপুর ফাউন্ড্রিতে যোগ দিতে, যার ৬০ বছরের স্টে ছিল সে গেল রূপনারায়ণপুর কেবল ফ্যাক্টরিতে যোগ দিতে। আমার স্টে ছিল সাড়ে তিন বছরের বেশি কিন্তু চার বছরের কম — আমি রওনা হলাম মানকাপুর, আইটিআই-তে যোগ দিতে।

সকাল ৬টায় ট্রেন বিহারের বেগুসরাইতে পৌঁছেছে। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট যাতে কার্যকরী না করা হয় তার জন্যেই চারদিকে প্রবল আন্দোলন। কলকাতার একটি উচ্চবর্ণের ছাত্র প্রতিবাদী হয়ে উঠল বেশি মাত্রায়। কলকাতার রাজপথের ফুটপাতে বসে শুরু করল জুতো পালিশের কাজ। আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি ছেপে দিল তার। দিল্লীর এক ছাত্র প্রকাশ্য রাজপথে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার নাটক করল। দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হল তার ছবি। আমার মানকাপুর যাওয়ার ট্রেন আটকে রইল বেগুসরাইতে। বেলা ১২টা পর্যন্ত বসে রইলাম ট্রেনে। অবস্থা ক্রমে ক্রমে ঘোরালো হয়ে আসছে। জানি না, আরও দু-এক দিনের মধ্যে ট্রেন চালু হবে কিনা। অনেক কষ্টে খোঁজ পেলাম এক আত্মীয়ের। আমার এক দুর সম্পর্কের ভাগ্নে স্বপন চাকরি করে বেগুসরাইয়ের ইন্ডিয়ান অয়েল অফিসে। তার কাছে গিয়ে তিন রাতে কাটালাম। তারপর রওনা হয়ে গেলাম মানকাপুরের দিকে।

বছর আড়াইয়ের মাথায় ফিরে এলাম কলকাতায়। কলকাতার মেডিকেল কলেজে অনগ্রসর শ্রেণিসমূহের ছাত্রদের সংরক্ষণে ভর্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। বিকেলে কলেজ স্ট্রিট দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ নজরে এল। বেশ কিছু ছাত্রদের সমাবেশ। বর্তমানকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখনও মুখ্যমন্ত্রী হননি। বক্তৃতার মধ্যে তিনি তার মনের কথা শোনালেন : সংরক্ষণ ভাঙিয়ে ডাক্তার হওয়া যায় না, সংরক্ষণে ডাক্তার হলে রুগির 'হার্ট' অপারেশন করতে গিয়ে 'লাঙ' কেটে দেবে। ঠিকই তো যোগ্যতা না থাকলে ডাক্তার হওয়া যায় কি? আমার জানা আছে অন্য কথা। সংরক্ষণে ভর্তি হয়ে কুমারেশ হালদার এমবিবিএস-এ গোল্ড মেডালিস্ট হয়েছিল। সংরক্ষণে ভর্তি হয়ে নীরোদ বিহারী রায় বাঙলায় এমএ-তে ১ম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিল। সংরক্ষণে ভতি হয়ে এমটেক-এ সন্তোষকুমার সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিল।

সুচিকিৎসার বিচারে তামিলনাড়ু বেশ গৌরবময় স্থানে রয়েছে। কলকাতার মানুষও জটিল ব্যাধির সুচিকিৎসার জন্য ছুটে যাচ্ছে ভেল্লোরে, তামিলনাড়ুতে। সেখানকার প্রান্তিক মানুষ শূদ্রও অস্পৃশ্যরা আন্দোলন করে স্বাধীনতা লাভের প্রায় দুদশক পরে ১৯৬৭ সাল থেকে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ৬৯ শতাংশ সংরক্ষণ ভোগ করে থাকে ডাক্তারি ও ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। ধরে নেওয়া যায়, সেখানদার ডাক্তাররা অধিকাংশই সংরক্ষণের কোটা থেকে এসে ডাক্তারি পড়ে ডাক্তার হয়েছে বা হচ্ছে।

খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন এসে পড়ে দেশের কোথাও তো ৬৯ শতাংশ সংরক্ষণ নেই, তামিলনাড়ুতে এটা হল কি করে? আসলে দেশের স্বাধীনতার অনেক আগে থেকে প্রান্তিকেরা তামিলনাড়ুতে ভীষণ ভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছিল। সেই অত্যাচার এবং নির্যাতন তাদের মধ্যে জন্ম দিতে পেরেছিল অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যৌথ ভাবে লড়াই করার। আন্নাদুরাইয়ের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন একটা চরম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীনতা লাভ করল সেই আন্দোলনকারীরা গড়ে তুলল রাজনৈতিক দল। 'দ্রাবিড়-মুন্নেত্রা

- কাজাঘাম' এই নাম দিল। সংক্ষেপে ডিএমকে। স্বাধীন ভারতের সংগঠিত চতুর্থ মাদ্রাজ রাজ্য নির্বাচনে এই রাজনৈতিক দল সেখানে দুই-তৃতীয়াংশ আসনের থেকেও বেশি আসন পেল। জনগণনায় সেখানকার প্রান্তিক মানুষ মোট জনসংখ্যার ৬৯ শতাংশ। তারা রাজ্যের বিধান সভায় জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণ পাশ করিয়ে নিয়েছিল এবং সেই নিয়ম চলে আসছে সেখানে। বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা সেই আইনটি সংবিধানে 'নাইনথ সিডউলে'র অন্তর্গত করেছিল। তাদের রাজ্যের পাশ করা সেই আইন পরবর্তী কালে আর কখনও কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হয়নি। এবং হয়নি বলে আজো চলে আসছে সেই নিয়ম।

ভারত স্বাধীন হল। ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি থেকে স্বাধীন দেশে নিজস্ব সংবিধান চালু হয়ে গেল। তখন থেকে আমাদের দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী ভারত। সংবিধান মোতাবেক কেন্দ্রে ও প্রতিটি রাজ্যে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের কাজ শুরু হল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে তখনো অবদি নিজস্ব কোনো দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা যায়নি। দেশের প্রথম গণনির্বাচন হয়েছিল পাকা চারমাস ধরে। ১৯৫১ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অবদি। দেশের প্রথম নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সবথেকে বেশি ভোট পেয়েছিল মাদ্রাজ-প্রভিন্স, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলায়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষক সমাজই কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকেছিল বেশি করে। আগেই বলেছি বামপন্থা মানেই উদার মনস্কতা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে কমবেশি বামপন্থা বিরাজ করে। দেশের প্রান্তিক মানুষকে বামপন্থা বেশি বেশি করে আকর্ষণ করবে — এটাই তো স্বাভাবিক।

দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। **"The election showed that on the whole Indian public opinion was veering towards the Left. The communist party which had close on 30,000 members had won the votes of almost 6,000,000 people. It had secured a particularly strong foothold in West Bengal and the Southern States – Madras, Hyderabad, Travancone-Cochin where the main stay of its support was provided by the mass peasant organisation."**[৫] আমার শৈশবে দেখেছি আমাদের যতপরোনাস্তি প্রান্তিক গাঁগুলি থেকে বেশ দূরে থাকত ভদ্রলোকদের অঞ্চল, আমরা বলতাম বাবু-অঞ্চল। সেখান থেকে কেউ কেউ এসে আমাদের অঞ্চলের সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত। আমাদের অঞ্চল মানে তো নিরক্ষর মানুষের বাস ছিল বেশি। যারা শিক্ষিত তারা তো মূলত প্রাথমিক পাশ কিংবা জুনিয়র হাই পাশ। কৃষিজীবী কিংবা মৎস্যজীবী ছিল তারা। যাতায়াতের রাস্তা তেমন ছিল না। যা ছিল সে তো গ্রামের মানুষদের নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তোলা মেঠো কাঁচা পথ। লাল নিশান নিয়ে কমিউনিস্টরা আসত। তারা গাঁয়ের কাঁচা রাস্তায় লাল নিশান উড়িয়ে হাঁটত — সঙ্গে স্থানীয় মানুষ এক-দু'জন। কখনো আবার একেবারেই কেউ থাকত না। আমার বয়সের ছোট ছেলেরা কেউ কেউ তাঁদের পেছন পেছন দৌড়াত। কেউবা তাদের হাত থেকে লাল পতাকা তুলে নিত হাতে। বলত,

---

৫. **K. Autonova, G. Bongard-Kevin, G. Kotovski, A History of India, Book-II, Progress Publishers Mosco, 1st ed. 1978, pp 273.**

'আমরা সবাই গরিবরা কিষাণ হাতে নিলাম লাল নিশাণ'। বিষয়টা বোঝা এবং না বোঝার মধ্য দিয়ে একপ্রকার হৃদয়-জাত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটাত।

১৯৫১-৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে দেশের লোকসভা কেন্দ্র ছিল ৪৮০ টি এবং রাজ্যগুলিতে বিধানসভা কেন্দ্র ছিল ২২৪৮ টি। "In the parliamentary elections the National Congress gained 44.5 percent of the votes and 74.3 percent of seats (under a majority system) and the Communist Party and its allies gained 6.7 percent of the votes and close on 10 percent of seats. The Right Socalist secured 12.6 percent of the votes but less than 5 percent of seats and the three parties of the Right : Hindu Mahasabha, Ram Rajya Parishad and Jan Sangha gained 4.8 percent of votes and 10 seats (of a total 480)."[৬]

দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল ৮০টি রাজনৈতিক দল। আসলে অনেক সামাজিক সংগঠন রাতারাতি রাজনৈতিক দলের তকমা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল নির্বাচনে। প্রথম মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে ১৯৫২ সালে কংগ্রেস ১৫২ আসন পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া ৬২ টি আসন পেয়ে হয়ে ছিল সেখানে প্রধান বিরোধী দল।

The National Congress was in the centre of the spectrum of Indian politics as it were : various reactionary parties of a feudal or communalist types made up its Right wings. The most influencial of these were The Ram Rajya Parisad (The Society of Believers in the State of the God Rama) set up by former princes, and the Hindu Maha Sabha, the oldest organisation representing the Hindu Community and, to a lesser extent, the Jan Sangha (People's Union) that had come into being just before the elections and drew the bulk of its support from the Hindu commercial bourgesisic and the chauvinisticaly inclined sections of the urban middle classes.[৭]

শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি একদিকে ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্ব দিয়েছে তেমন, তাদেরই একটা অংশ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে আবার। প্রান্তিক ভারতের যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরকাল হয়ে থেকেছে তাদের কামনার বস্তু — তাদের মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকারের স্বপ্ন — যুগযুগান্তর ধরে চলে আসা অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত হবার আরাধ্য পথ — এদেশের চরম দুর্ভাগ্য এবং অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয় এখানে যে তাদের মধ্য থেকে সমাজতন্ত্র কায়েমের নেতৃত্ব উঠে আসতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা-কাল থেকে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে যে জিনিষটি শক্তপোক্ত হয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে তা হল এ দেশের রক্তমাংসে জড়িয়ে থাকা এক বুর্জোয়া ন্যাশনালইজম। সেই বুর্জোয়া ন্যাশনালইজমদের সাথে এদেশের প্রবল প্রান্তিকতার মধ্যে বসবাসকারী জনসাধারণের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি,

---

৬. ibid.

৭. ibid : 272

গড়ে ওঠেনি আত্মীয়তার বন্ধন। গড়ে ওঠেনি বলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকা সব থেকে বড় জাতীয় প্রতিদান দেশের প্রান্তিকদের দারিদ্র মোচনে কোনও কর্মসূচি আন্তরিকতা দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি, পারা সম্ভব হয়নি।

এই সময়ে কর্পোরেট দুনিয়ায় এন আর নারায়ণমূর্তি এক বিস্ময়কর সাফল্যের মানুষ বলে পরিচিত। ধনতন্ত্রের সাথে পাল্লা দিয়ে তার ইনফোসিস কোম্পানি প্রচুর অর্থের মালিকও হতে পেরেছে। প্রান্তিক মানুষের সামাজিক কল্যাণ তা দিয়ে কি হল না হল সে প্রশ্ন তোলা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। জার্মান দেশের 'যারবিস' পত্রিকা এক সমীক্ষায় সাম্প্রতিক কালে জানিয়েছে, সারা পৃথিবীর প্রথম একশ জন ধনীর মধ্যে বিশ জন ভারতীয়। এটা খুব কম গর্বের কথা নয়। যিনি সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে যান তিনিই আবার অবচেতন মনে ভাবেন আমরা বড় নিঃস্ব, কাঙাল। তাই বোধ করি এনআর নারায়ণ মূর্তিও বলেন : **Is there one invention from India that has becone a household name in the globe? No such contribution in the last 60 years.**[৮] দারিদ্র মোচন করে কোনও ইতিহাস গড়তে পারলে সেটাই তো হত ইতিহাস।

কেউ পড়ে লা মার্টিনায়, কেউ পড়ে ডনবস্কোতে, কেউ পড়ে সেন্ট জেভিয়ার্সে। কেউ পড়ে সরকারি পাঠশালায়, কেউ পড়ে কর্পোরেশনের শিক্ষায়তনে, কেউ পড়ে অঙ্গনওয়াড়ি বিদ্যালয়ে। এভাবে এদেশে শিক্ষার দুটি পাশাপাশি জগৎ চলতে থাকে। আলো-আঁধারির জগৎ। একদিকে আলো তার রশ্মি ছড়ায়, অন্যদিকে আলোর মধ্যে থাকার কথা ভাবতে ভাবতে একটা প্রজন্ম পা বাড়ায় অন্ধকারের দিকে। সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সেখানে দখল করে বিশিষ্ট স্থান। হালফিলে একটি সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের রুর‍্যাল ডেভলপমেন্ট মিনিস্ট্রি থেকে প্রকাশিত হয়েছে Socio-Economic and Caste Census : 2011। ভারতের মানুষের একটা প্রান্তিকতার চেহারা ফুটে উঠেছে সেখানে। তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা আরও করুণ। **"The survey also mentioned that begging was the main source of income for 1.26% of the rural households in Bengal. This is considerably higher than the national average of 0.37%. Among 1,57,56,852 rural households in the state the main source of income for 1,97,818 households in begging. In the begging Bengal was followed by Assam (0.70%) and Odisha (0.63%)."**[৯] এই প্রসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তলার দিক থেকে চতুর্থ স্থানে এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তলার দিক থেকে তৃতীয়স্থানে আছে। এই দুর্গতির মুখ দেখতে দেখতে ভিতরে যে কান্না উৎগত হয় তা সরিয়ে রাখব কোথায়! কমিউনিস্টরা না এই বাঙলায় একটানা চৌত্রিশ বছর রাজত্ব করেছে? সত্যিই কি যারা সেদিন রাজ-ক্ষমতায় দেখভাল করেছিল তারা কমিউনিস্ট ছিল! প্রান্তিক মানুষের বন্ধু ছিল? প্রান্তিক মানুষের বন্ধু বলে এই কমিউনিস্টদের বিশ্বাস করা অনুচিত। রিপোর্ট তো প্রকাশিত হয়েছে ২০১১ সালে। বাঙলার ১,৯৭,৮১৮ টি পরিবারের

---

৮. Times of Inida, Kolkata, June 17, 2015, pp 14.

৯. Times of India, Kolkata, Saturday, July 18, 2015, pp 9.

সংসার চলত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে।

আসলে যে কথাটা স্পষ্ট করে বলতে চাই, দোষ কোনও ইজমের নয়, দোষ প্রয়োগকর্তাদের। কোনও পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব যাদের ওপরে থাকে দোষ তাদের।

প্রান্তিকতা থেকে মানুষ নিজেদের চেষ্টায় মুক্ত হতে চাইছে নিজেরা। এমন একটা ঘটনার উল্লেখ করি। গ্রামটির নাম শক্তিপল্লী, বাঁশড়া। ক্যানিং লাইনের ট্রেনে গিয়ে নামতে হয় বেতবেড়িয়া স্টেশনে। সেখান থেকে হেঁটে গিয়েছি ওই গ্রামে। প্রান্তিক মানুষেরাই বাস করে অঞ্চলটিতে। মানুষটির নাম মনোরঞ্জন হালদার। স্ত্রীর নাম চারুবালা। কাঁচাবাড়ি। বাঁশের বেড়া। দলিত সমাজের কয়েকজন ডাক্তারবাবু প্রান্তিক মানুষের জন্য বিনা পয়সার একটা চিকিৎসার জায়গা করতে চান এই বাঁশড়ায়। মনোরঞ্জন হালদার বিনা পয়সায় ১৪ কাঠা জমি দান করেছেন ওখানে বিনা পয়সার সেবা কেন্দ্র গড়ার জন্যে। শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র হবে পরিচালনায় খুলনা সেবা সমিতি। ডাঃ সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, সঞ্জীব কুমার মণ্ডল, ডাঃ আশিসকুমার ঠাকুর প্রমুখরা এগিয়ে এসেছেন এ্কাজে। স্থানীয় মতুয়াদের একটা সভা হয়েছে ওই গ্রামে ০৫-০৭-২০১৫ তারিখে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা মতুয়া মহাসংঘও হাত বাড়িয়েছে সহযোগিতার। জেলা কমিটির সম্পাদক ডা. সঞ্জয় সরকার ও পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের। এই জেলায় ২০০৭ সাল থেকে গড়ে ওঠে জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে 'শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র' নির্মাণ-সভায় উপস্থিত থাকতে পারাটা আমার কাছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষের একজনের ঋণ ও ভালোবাসা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রান্তিকেরা চিরকাল কমিউনিজমের জয়গান গায়। গায়, তার কারণ তারা জানে, দেশে কমিউনিস্ট সরকার হলে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব সরকার নিজের কাঁধে তুলে নেয়। আর তা যখন তারা করে না তখন তারা কমিউনিজমের নামে অন্য কিছু করেন এমন এক প্রতীতির জন্ম হয়। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল ভারতের শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চনার প্রতিরোধ কল্পেই বিশ শতকেব বিশের দশকের শেষে এবং ত্রিশের দশকের শুরুতে। প্রথম দিকে তা শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, তেমনি প্রভাব বিস্তার করেছিল কৃষক সমাজের মধ্যে। জনসমর্থনে তাদের প্রভাব দিন দিন বাড়ছিল। দেশের সর্বত্র নয়, কিছু কিছু জায়গায়। সবাইকে এক ছাতার নীচে এনে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম All India Workers' and Peasants' Party তাদের সম্মেলন করে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই মর্মে, দেশের স্বাধীনতা লাভে শ্রমিক শ্রেণিকে দায়িত্ব নিতে হবে বড় করে। শ্রমিক ও কৃষকদের মিলিতভাবে দায়িত্ব নিতে হবে শ্রেণি সংগ্রামের। এই সময়ে বাঙলায় পাঞ্জাবে ও মুম্বাই প্রদেশে শ্রমিক শ্রেণির পাশাপাশি ছাত্রদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারিত হয়।

কমিউনিস্ট আন্দোলন যাতে প্রভাব বিস্তার না করে তার জন্য ব্রিটিশ সরকার উদ্যোগী হয়। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। মিরাট কনসপিরেসি অভিযোগ আনা হয় অনেকের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতৃত্বের অনেককে জড়িয়ে দেওয়া হয় তার সাথে। কমিউনিস্টদের মূল লক্ষ্য ছিল 'to

denounce British Colonial policy in India and also had propagated the ideas of scientific socialism.'[১০]

সোসালইজম হল বঞ্চিতদের, শোষিতদের বেঁচে ওঠার মন্ত্র। ভারতীয় সমাজ বাস্তবতা স্পষ্ট উপগম্যিতায় আনায়ন করতে না পারলে সমাজতন্ত্রের মন্ত্র দান করবে কে? ভারতীয় সমাজ বাস্তবতায় শোষণের তিনটি শক্ত স্তম্ভ আজন্মের লালন-পোষণের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে চলে আসছে। স্তম্ভ তিনটি হল কাস্ট, ক্লাস ও প্রেপ্তার। ধর্মের আঙিনায় মনুষ্য সমাজ চারটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে আদিকাল থেকে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই বর্ণগোষ্ঠীর হাতে সর্ববিধ ক্ষমতা-সম্পর্কগুলি অধিকার হিসাবে ন্যাস্ত থাকার ফলে মানুষের মনন জগতটাও গড়ে ওঠে সেইভাবে। সাহিত্যের ভুবনটা প্রকটিত হয় একইভাবে। একজন খুব বড় মাপের সাহিত্যিক অকপটে লিখে ফেলতে পারেন শশী ডোমের কথা। "চুরির নেশা এই ডোম বংশটির কণায় কণায় যেন জলের সঙ্গে মহামারীর বীজাণুর মত মিশিয়া আছে। আর তাহা পুরুষে পুরুষে বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই ব্যবসায় তাহারা নিয়মিত ভাবে করিয়া আসিতেছে। টাকা নয়, তৈজসপত্র নয়, শুধু ধান। ধানের মরাই হইতে সুকৌশলে ধান বাহির করিয়া লয়, ধানের গোলার দুয়ারে যেমনই তালা দেওয়া থাকুক না কেন — সে তালা তাহারা খুলিয়া ফেলিবেই এবং সুকৌশলে আবার বন্ধও করিয়া দিয়া যাইবে।"[১১]

লেখক এটুকু বলেই থেমে থাকেননি। চমৎকার বর্ণনা দেন শশী ডোমের। "শশী ডোম এখন দলের নেতা, দীঘল ছিপছিপে শরীর, গতি যেন বায়ুর মত, একহাত ব্যবধান হইতেও তাহার পিছনে ছুটিয়া আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ধরিতে পারে নাই। পুলিশের লোক মধ্যে মধ্যে বলিয়া থাকে, 'বেটা যদি সিঁদ দিতে আরম্ভ করত তবে আর রক্ষে থাকত না'। শশীও সে কথা বহুবার শুনিয়াছে, কিন্তু সিঁদ দিতে কখন চেষ্টা করে না। তাহাদের বংশানুক্রমিক চুরির ধারা পদ্ধতি ছাড়া অন্য ধারা পদ্ধতি তাহার ভাল লাগে না।"[১২]

ছোট জাতিগোষ্ঠীতে জন্মালে চারিত্র্য গুণে তারা চোর হতে পারে এমন প্রতীতিকে প্রতিষ্ঠা দিতে লেখকের কোনও বেগ পেতে হয় না — এ যেন আদি অনন্তকাল থেকে চলে আসা প্রকৃতির নিয়ম, সামাজিক অবস্থানের চিরাচরিত প্রত্যয়। সে প্রত্যয়কে ভাঙতে গেলে তো সমাজতন্ত্রের পথে হাঁটতে হয় মানুষকে। আর সে পথে হাঁটার পূর্ব শর্ত হিসাবে প্রয়োজন পড়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব করার। প্রয়োজন পড়ে ফরাসী দেশের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আলথুয়ার্সের। প্রয়োজন পড়ে ইতালী দেশীয় বামপন্থার দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির। ভারতবর্ষে তেমন কারও জন্ম হল না কেন সে ইতিহাস কারুণ্যের উদ্রেগ করে।

উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ সুদীর্ঘ সামাজিক আন্দোলন করার পরেও

---

১০. K. Antonova, G. Bongard-Levin, G. Kostovsky A History of India, Book-II, Progressi Publishers, Mosco, 1st ed. 1978, pp 189.

১১. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃ ২১৪।

১২. ibid.

স্বীকৃত বিষয় হয়ে ওঠেনি আজও। বাঙলার ডোমেদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নিয়ম তারাশঙ্কর তা তার 'চোরের মা' ছোটগল্পে পাঠকদের জানিয়েছেন। কিন্তু "ফিঙে শশীর দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠের সন্তান, একমাত্র সন্তান। ফিঙের বাপ নিতান্ত শৈশব অবস্থাতে মারা গিয়াছে। ফিঙের মা তাহাদের সমাজে প্রচলিত অনুকূল বিধান সত্ত্বেও আর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে নাই।"[১৩] একথা বলে ডোম পরিবারের বালবিধবাকে উচ্চ বর্ণের সমতুল্য কৌলিক বিধবার মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি। যে কথাটা বলার তা হল ডোম পশ্চিমবঙ্গের একটা জনগোষ্ঠী। "২০০১ এর লোক-গণনায় ডোমেদের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৩৭। এঁরা দলিত জাতিভুক্ত মানুষদের ১.৭ শতাংশ। ডোমদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (২০.৫ শতাংশ) শহরবাসী। বাস প্রধানত বর্ধমান (২৭.৭ শতাংশ), বীরভূম (২২.৫ শতাংশ), বাঁকুড়া (৯.৯ শতাংশ), মেদিনীপুর (১১.৫ শতাংশ) ও হুগলি জেলায় (৬.৪৭ শতাংশ)।"[১৪]

সংখ্যায় অত্যল্প হলেও স্বাধীনতার উত্তরকালে ডোমদের কিছু মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য হয়ে ওঠার যোগ্যতাও অর্জন করেছে কেউ কেউ। কেউ কেউ মনোনিবেশ করেছেন সাহিত্য সৃজনার কাজে। সাহিত্য সৃজনায় ব্যাপৃত যারা — তারা নিশ্চয়ই শশী ডোমকে একজন চোর বলে প্রতিষ্ঠিত করছেন না। এটাই হল স্বাধীনতার উত্তরকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে বড় রূপান্তর। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এই রূপান্তরের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বিস্তৃত পরিসরে। বিগত তিন দশক ধরে রূপান্তরের সাহিত্যের একজন কর্মী হিসেবে কাজ করছি। বক্তৃতা করেছি অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত রাষ্ট্রীর বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের ইংরেজি বিভাগ, কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সমাজবিদ্যা বিভাগ, ডিরোজিও মেমোরিযাল কলেজের ইংরেজি বিভাগে রূপান্তরের সাহিত্য নিয়ে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।

---

১৩. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৯, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃ ২১৪।

১৪. সন্তোষ রাণা, কুমার রাণা, পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, ক্যাম্প, ২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল - ৭৩, ১ম সং ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫৪।